প্রথম অধ্যায়

নির্বাচিত উপন্যাসে সময়ের স্বর ঃ নিবিড় পাঠের প্রাথমিক উপস্থাপনা

সময়ের সঙ্গে পরিবর্তন মৃত্যুর মতোই অমোঘ সত্য। সাহিত্যের (ে ত্রেও পরিবর্তন ঘটে চলেছে সর্বদাই। তবে তারই মধ্যে আমরা ল(্য করি যে কোনো বিশেষ সময় অথবা ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাহিত্যে পরিবর্তনের জোয়ার ওঠে। শতকের সন্ধিবেলাও তেমনি সাহিত্যের পালাবদলের চিহ্(কে ধারণ করে আমাদের বিশেষ অভিনিবেশ দাবি করে। তবে শতক বদলের সঙ্গে সঙ্গে হিসেব-নিকেশ করে পুরনো রীতির শেষ এবং নতুন রীতির প্রারম্ভ হয় না, এর ফলে সন্ধি(ণের সাহিত্য চিহ্নি(ত হয় এক অস্থিরতা, দ্বিধার দ্বারা। বি(্ব সাহিত্যের সম্বন্ধে যেমন এ কথা বলা যায়, তেমনি যথাযথ বাংলা সাহিত্যের (ে ত্রেও।

বাঙালির জীবন ও সাহিত্যে উনিশ শতক এক উল্লেখযোগ্য সময়কাল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষেই দেখি ইংরেজি শি(া, সাহিত্য, জীবনচর্যা বাঙালির চিন্তা-চেতনাকে প্রভাবিত করতে শু(করেছে। ব্যক্তি(স্বাতন্ত্র্যবোধেরও জাগরণ ঘটছে। কিন্তু মধ্যযুগীয় সংস্কার, সামন্ততান্ত্রিক সমাজচেতনা সম্পূর্ণ বিলীন হয়নি। ফলে সনাতন প্রাচীন ও আধুনিক নবীনের মধ্যে সংঘাত দেখা দেয়। উনিশ শতকের পুরোটাই এই সংঘাতের চিহ্(নিয়ে বিদ্যমান। ইউরোপীয় নবজাগরণের ছোঁয়ায় মানবপ্রত্যয় এই সময়ের যুগল(ণ হিসেবে উঠে এসেছে, কিন্তু সামূহিক সমাজকেন্দ্রিকতা মানবচেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বাংলা সাহিত্যের (ে ত্রে উনিশ শতক নানা নতুন সাহিত্য শাখার জন্মদাতা। উপন্যাস, ছোটগল্প, সাহিত্যিক মহাকাব্য, সুচিন্তিত প্রবন্ধ-সাহিত্য সবই উনিশ শতকের সন্তান। উনিশ শতকে ভূমিষ্ঠ হওয়া এই সকল সাহিত্য মাধ্যমের মধ্যে উপন্যাসের কথা এখানে আলোচ্য। উনিশ শতকের নবজাগরণ প্রাচ্য মননে পাশ্চত্য শি(া সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সংস্পর্শে যে নতুন জগৎ তৈরি করেছিল তারই একটি প্রকাশ বাংলা উপন্যাস। ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত হয় মান্যতা প্রাপ্ত সংজ্ঞানুসারী প্রথম বাংলা উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দুর্গেশনন্দিনী'। ১৮৮৭ সালে প্রকাশিত হয় বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ উপন্যাস 'সীতারাম'। কোনো একক ব্যক্তি(র স্বর সামাজিক সময়ের স্বর হয় না। কিন্তু যুগন্ধর ব্যক্তি(দের সমাজভাবনার মধ্যে সেই সমাজের এবং সময়ের রূপ অনেকটাই প্রকাশিত হয়, একথাও অস্বীকার করার মতো নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে নীতি ও লেখকসত্তার যে বিরোধ তা আসলে সেই সময়ে পাশ্চাত্য শি(ায় শি(িত সমাজে

ব্যক্তি(বনাম গোষ্ঠীর বিরোধও প্রতীকায়িত করে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সে সময়ের অনেক ঔপন্যাসিক লেখনী ধারণ করেছিলেন। তাঁদের আপাতত আলোচনায় না এনে যে নামটিকে বিশেষ গু(ত্ব সহকারে স্মরণ করছি, সে নামটি হল ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। ১৮৯২ সালে প্রকাশিত তাঁর 'কঙ্কাবতী' কার্নিভালের আমেজ আর জাদু বাস্তবতার সহযোগে সে সময়ে দাঁড়িয়ে এক আশ্চর্য সৃষ্টি। ত্রৈলোক্যনাথের গল্প-উপন্যাসগুলির সে সময়ে যথার্থ মূল্যায়ন কেউই করতে পারেন নি। সময়ের যথার্থ দর্পণ তাঁর সাহিত্যকৃতিগুলি বয়স্ক পাঠ্য রূপকথা হিসেবেই পরিচিত ছিল দীর্ঘকাল।

উনিশ ও বিশ শতকের সন্ধিবেলা মূলত চিহ্নি(ত হয়ে আছে রবীন্দ্র উপন্যাসের দ্বারা। ১৮৮৩ সালে প্রকাশিত 'বউঠাকুরাণীর হাট' অথবা ১৮৮৭ সালে প্রকাশিত 'রাজর্ষি' তেমন কোনো নতুন ধারার জন্ম দিতে না পারলেও 'চোখের বালি' (১৯০৩), 'গোরা' (১৯১০), 'ঘরে বাইরে' (১৯১৫), 'চতুরঙ্গ' (১৯১৫), 'যোগাযোগ' (১৯২৯) বাংলা উপন্যাসকে এক নতুন দিশার সন্ধান দেয়। রবীন্দ্রনাথের আগমনে কুশীলবদের মনোবি(-ষণের যে ধারা বাংলা সাহিত্যে ত্রিশের দশক থেকে জোরদার হয়, তারও আরম্ভ হয়। 'চোখের বালি'র মতো উপন্যাসে পাত্রপাত্রীদের আঁতের কথা যেভাবে রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছেন, তার আগে এমন করে কেউ করেনি। আবার মহাকাব্যিক উপন্যাস (গোরা) কিংবা তত্ত্ব প্রধান জীবন রহস্য অনুসন্ধানী উপ্যনাস (চতুরঙ্গ) বাংলা সাহিত্যে এই দুটি ধারাই নিয়ে এলেন রবীন্দ্রনাথ। উপন্যাস সমাজের দর্পণ হিসেবে সময় ও সমাজের চেহারাকে প্রকাশিত করবে তাতে আর সন্দেহ কি। তবে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে সময় ও সমাজের যেভাবে প্রকাশ ঘটেছে তা এর আগে বাংলা উপন্যাসে দেখা যায়নি। রাজনৈতিক সময় 'গোরা', 'ঘরেবাইরে' উপন্যাসে এসেছে যথাযথভাবে। আবার উগ্র স্বাদেশিকতা চেহারা তুলে ধরেছেন 'চার অধ্যায়' ও 'ঘরেবাইরে' আখ্যানে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যার বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকের মধ্যেই তাঁর প্রায় সব উপন্যাস লিখেছেন। বাস্তব থেকে উপাদান নিয়ে লোক মনোরঞ্জক আবেগধর্মী উপন্যাস রচনা করার কৃতিত্ব শরৎচন্দ্রকে আজও জনপ্রিয় করে রেখেছে। অথচ এই তিন দশকে ঘটে যাচ্ছে প্রথম বি(শ্বযুদ্ধ। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন এ সময়ে জোরদার হচ্ছে, বাংলাকে কেন্দ্র করে। বিশ শতকের প্রথমভাগ ছিল যেমন ঘটনা বহুল তেমনি দ্বিতীয়ভাগেও ছিল ঘটনার ঘনঘটা। সদ্যোজাত স্বাধীনতা দেশবাসীর জীবনে নিয়ে এসেছিল একই সঙ্গে খুশি এবং দুঃখ, স্বপ্ন এবং স্বপ্নভঙ্গ। দ্বিখণ্ডিত দেশ, উদ্বাস্তুর ঢল জনমানস ও জনজীবনকে করেছিল বিধ্বস্ত। বিশ শতকের প্রথম দু'তিন দশককে রবীন্দ্রনাথের বিপুল প্রতিভা শাসন করলেও ত্রিশের দশক থেকে দেখা দিয়েছিল কল্লোলীয়দের অবির্ভাব(পাশ্চাত্য তত্ত্বের সংস্পর্শে অনভিজাত মানুষ, শ্রমিকবর্গ সাহিত্যের আঙিনায় প্রবেশ করছিল। দ্বিতীয় বি(শ্বযুদ্ধের পর মূল্যবোধের বিপুল অব(য়,

একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙন, গোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে ব্যক্তি(সর্বস্বতা— জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যও প্রভাব ফেলেছিল।

স্বাধীনতার পর কিছুদিন ছেঁড়াখোঁড়া স্বপ্ন নতুন করে বোনার চেষ্টায় কেটে গেল। কিন্তু ভাঙা কাঁচের মতোই ভাঙা স্বপ্ন জোড়া তো লাগেই না বরং ভাঙা স্বপ্নের আঘাতে মনের রক্ত((রণ ঘটাই স্বাভাবিক। তাই সত্তরের দশক আসতে আসতে দেখা গেল অসন্তুষ্টির আগুন জ্বলে উঠতে শু(করল এদিক ওদিক। নকশাল আন্দোলনের তাপে যে পরিবর্তন এল তাতে সাহিত্যেও নিয়ে এল নতুন পথ ও পাথেয়। এই আন্দোলন বিশ শতকের শেষ তিন দশক তো বটেই বিশ ও একুশ শতকের সন্ধিবেলার সাহিত্যকে করেছে প্রভাবিত। মূলত আলোচ্য এই সন্ধিবেলার বাংলা সাহিত্যের আলোচনার নান্দীপাঠ আমরা শু(করতে পারি এই জায়গা থেকেই। রাজনৈতিক আন্দোলন হিসেবে নকশালবাড়ি আন্দোলন সম্পূর্ণ সফল হয়নি, হওয়ার মতো প্রস্তুতি আন্দোলনকারীদের ছিল না। রাষ্ট্রীয় অত্যাচারের বি(দ্ধে নির্বিচারী অত্যাচার আন্দোলনকে বিপথে চালিত করেছিল। কিন্তু সে যাই হোক, সাহিত্যের (ে ত্রে এ আন্দোলন এক লেখকগোষ্ঠীর জন্ম দিয়েছিল, যে গোষ্ঠীর লেখকরা জীবনকে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখছিলেন। মহাশ্বেতা দেবী ও দেবেশ রায় এই গোষ্ঠীর বরিষ্ঠ মশালচি দুই লেখক। রক্ত(াক্ত(সময় তাঁদের ভাবনা-চিন্তাকে স্বতন্ত্র দিশা দিয়েছে। আধিপত্যবাদের বি(দ্ধে প্রতিবাদ সসম্মানে বেঁচে থাকার একমাত্র রাস্তা এ শি(া তাঁদের দিয়েছিল এই সময়। রাষ্ট্রীয় ফ্যাসীবাদী প্রতাপের বি(দ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে এক উজ্জ্বল প্রতিভাশালী প্রজন্মের হারিয়ে যাওয়া মহাশ্বেতা দেবীকে দিয়ে লিখিয়ে নেয় 'হাজার চুরাশির মা' (১৯৭৪), 'অরণ্যের অধিকার' (১৯৭৭)-এর মতো উপন্যাস আর দেবেশ রায় লেখেন 'যযাতি' (১৯৭৩), বোনে চলেন একের পর এক বৃত্তান্ত। আবার ভুললে চলবে না এপার বাংলায় যখন চলছে নকশাল আন্দোলন, ওপার বাংলায় তখন চলছে মুক্তি(যুদ্ধ। প্রতাপ, আধিপত্যবাদের বি(দ্ধে আন্দোলন এই দশককে চিহ্নি(ত করেছে।

সত্তরের দশকের পর বিশ শতকের শেষ দুই দশকে বাঙালির জীবনে অভিঘাত সৃষ্টিকারী খুব বড়ো কোনো ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু তাই বলে কি পরিবর্তন কিছু ঘটছিল না জনজীবনে? তা তো নয় বরং পরিবর্তন হচ্ছিল ত্বরান্বিত। তার কারণ এবার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের ঘরে ঘরে ঢুকে পড়তে শু(করছে সব পেয়েছির দেশ — টেলিভিশন — আর কিছুদিন পরই 'কেবল'-এর সুবিধা। কেবল-সংস্কৃতি নিয়ে এল ভোগবাদ, পণ্যায়ণকে সঙ্গী হিসেবে। উপনিবেশবাদের জোয়াল কাঁধ থেকে নামতে না নামতেই ঘাড়ে চেপে বসল নয়া-উপনিবেশবাদের ভূত। মিথ্যা আনন্দের দুনিয়ার মিথ্যা আত্মতুষ্টি তৈরি করছে এক চেতনার নিদালী। অব(য়ী আধুনিকতাবাদ পার করে এলো আধুনিকোত্তরবাদ — কিন্তু নতুন

কোনো আশ্বাস তো জাগল না কোথাও। অথচ আধুনিকতাবাদ অথবা তার পরবর্তী আধুনিকোত্তরবাদ মানে তো কেবল পণ্যায়ণ অথবা ভোগবাদ নয়। এই দুটো তত্ত্বও তো আসলে জীবনের সম্বন্ধে একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির কথাই বলে। কিন্তু এ সময়ের দ্রষ্টাচ(ু র অধিকারী লেখকরা দেখছিলেন যে মানুষের মননরাজ্য বিষিয়ে চলছে নয়া উপনিবেশবাদের ছোঁয়াচে রোগে। এমনকী সাহিত্যের জগতও সেই ছোঁয়াচে রোগের আওতামুক্ত(নয় পুরোপুরি। যখন কোনো কবি লেখেন —

'নিজের খুব কাছে যেতে পারিনি এখনো, পুলিশ রয়েছে।

অনেক বছর ধরে গোপনে চোরাপথগুলির ম্যাপ এঁকে চলেছি। কিন্তু সেই নিষিদ্ধ মানচিত্র জুড়ে এত অজানা ফাঁদ, মাইন, কঙ্কাল, পরিখা, চোরাবালি, ট্যাংক, অন্ধকূপ এবং উন্মাদ-আশ্রম যে ভয়ে বুক শুকিয়ে যায়। আরো সমস্যা এই যে সমস্ত পথের মুখ এক অদ্ভুত কুয়াশায় ঢাকা। নিওন-আলোর কুয়াশা। যার ভিতর চাইলেই পাওয়া যায় ব্যক্তি(গত বিমান, ব্যাংক, হারেম, পিয়ানো, সমুদ্রসৈকত। এক অবাধ অনন্ত আত্মসন্তুষ্টির রঙিন জগত। সেখানে কোনো বাধানিষেধ নেই, বরং অদৃশ্য প্ররোচনা এবং মদত রয়েছে। কারণ এগুলি আর কিছুই নয়, নিরীহ বন্ধুর মতো দূর থেকে, এক বিপজ্জনক, নিঃসঙ্গ বন্দীর কাছে সিগারেট ও চিঠি পাঠানো মাত্র।

প্রকৃত নিজের কাছে যাওয়া এক অকল্পনীয় অন্তর্ঘাত। সুড়ঙ্গ খুঁড়ে চলেছি, কিন্তু চতুর্দিকে পুলিশ রয়েছে'।[১]

— তখন বুঝতে পারি, যাঁরা এই অসময়ে নিজস্ব সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখতে চান, তাঁদের জন্য প্রতি পদ(ে পে কত ফাঁদ অপে(া করছে।

সত্তরের চেতনায় দী(িত যে লেখকরা এই সন্ধিবেলায় লিখে চলেছেন তাঁরা হলেন আবুল বাশার, নলিনী বেরা, তপন বন্দোপাধ্যায়, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, ভগীরথ মিশ্র, সৈকত র(িত, অভিজিৎ সেন, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, অমর মিত্র, স্বপ্নময় চক্র(বর্তী, মানব চক্র(বর্তী, সাধন চট্টোপাধ্যায়, কিন্নর রায়, রামকুমার মুখোপাধ্যায়, আফসার আহমেদ, রবিশংকর বল, সোহারাব হোসেন, নবা(ণ ভট্টাচার্য প্রমুখ। এঁরা সকলেই লেখা শু(করেছিলেন মোটামুটিভাবে সত্তরের দশকে বা তার পরের দশকে আর এখন পর্যন্ত লিখে যাচ্ছেন। এই লেখকগোষ্ঠীর লেখকদের লেখার যে বৈশিষ্ট্যগুলো একদম সাধারণভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেগুলিকে নির্দেশ করতে গেলে প্রথমেই যে বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যেতে পারে তা

হল, প্রতাপের বি(দ্ধে প্রতিস্পর্ধা ঘোষণা করা। এই লেখকগোষ্ঠীর অনেকে ব্যক্তি(গতভাবে নকশাল আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। আর যাঁরা তা করেননি তাঁরাও বুঝতে পারছিলেন প্রতাপের কোনো আলাদা জাত বা ধর্ম বা মতাদর্শ থাকে না। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-অর্থকৌলিন্য-মতাদর্শ নির্বিশেষে প্রতাপের চেহারা একই। আর প্রতাপের সামনে নতিস্বীকার মানে সব নিজস্বতার বিনাশ, ছাঁচে ঢালা পুতুলে পরিণত হওয়া। তাই এই লেখকগোষ্ঠী সবসময় শাণিয়ে রাখেন তাঁদের অস্ত্র। ফলে তাঁরা অনেকেই সোচ্চারভাবে প্রতিষ্ঠানের বিরোধিতায় নেমে পড়েন। যেহেতু স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান মানেই তা আধিপত্যবাদের হাতিয়ার তাই তাঁরা প্রতিষ্ঠানকেও প্রতিহত করতে চান।

এই সময়ের লেখকরা দেখছেন সন্ধিবেলায় অস্থিরতা, সংশয়, বি(োয়ন, নয়া সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন— আবার এসবের বি(দ্ধে যেহেতু তাঁরা গড়তে চান প্রতিরোধ ফলে জগৎ ও জীবনের যথাপ্রাপ্ত চিহ্(, কাহিনি সব কিছুই তাঁরা বিনির্মাণ করতে চান। ইচ্ছাপূরণের সরল কাহিনি দিয়ে বাস্তব তো প্রকাশিত হয়ই না, নিখাদ বাস্তব দিয়েও ঈপ্সিত মাত্রায় পৌঁছানো যায় না। এই উপলব্ধি সন্ধিবেলার এই পরিশ্রমী অ(র শিল্পীদের পৌঁছে দিয়েছে সময়ের নবনির্মাণের প্রচেষ্টার জায়গায়। তাত্ত্বিক সমালোচকের ভষায় বলা যেতে পারে —

> ‘প্রাতিষ্ঠানিক পণ্যসাহিত্যের চত্র(ব্যূহে যাঁরা আত্মসমর্পণ করেননি, সেইসব লিখিয়েরাই অনবরত নতুন বিকল্পের খোঁজ করেন। সেই খোঁজে ধরা পড়ে উপন্যাস সম্পর্কিত যাবতীয় প্রচলিত ধারার বিনির্মাণে, বাচনের নিত্যনতুন বিন্যাসে, মানবিক সম্পর্কের বিচিত্রতর গ্রন্থনায়, সময় ও পরিসরের অন্বয় ও অনন্বয়ের দ্বন্দ্বে আখ্যান আমাদের কাছে প্রকাশ্য জীবনের সঙ্গে সমান্তরাল প্রচ্ছন্ন জীবনের আভাস তুলে ধরে’।[২] (পৃ. ২৬, কোরক ঃ প্রাক শারদ সংখ্যা, ১৪১৫)

সর্বব্যাপ্ত বিকার ও বিদূষণ যেভাবে জীবনের সব ইতিবাচক দিককে বিনষ্ট করতে চাইছে তার বি(দ্ধে এই কুশলী কথাকাররা নেমে পড়েছেন সংগ্রামে। নিজেদের মতো করে বাস্তবের পুনর্নির্মাণ করতে গিয়ে কেউ গ্রহণ করেছেন কথকতার দেশজ ঘরানা আবার কেউ বা ল্যাতিন আমেরিকার ঐন্দ্রজালিক বাস্তবতার দেশীয় চেহারা তৈরির প্রচেষ্টা করছেন। পাশ্চাত্য থেকে আগত সাহিত্যশৈলী হিসেবে উপন্যাস ছিল সম্পূর্ণ এক নতুন ঘরানার প্রকরণ। বঙ্কিমচন্দ্র একে পাশ্চাত্যের ধাঁচেই গড়ে তুলেছিলেন। দেশীয় যে কাহিনি উপস্থাপনার রীতি ছিল তা সম্পূর্ণ চাপা পড়ে যায় উপন্যাসের আগমনে। দুই সহস্রাব্দীর মোহনায় বসে লেখকরা দেখছিলেন নিজেদের প্রাচীন ঐতিহ্যেই লুকিয়ে আছে মৃত

সঞ্জীবনী সুধা। ভগীরথ মিশ্রের মতো লেখক দেখেন, বোঝেন এবং ঘোষণা করেন যে এত দীর্ঘ সময় বিদেশী শাসকদের নির্মম শাসন এবং শোষণে বিনষ্ট হয়ে যায়নি ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পূর্ণ — এটা ল(ণীয় একটা বিষয়। সেই সঙ্গে বুঝে নেওয়া যায় যে এখানেই রয়েছে আমাদের বিশল্যকরণী। ভগীরথ তাই ফিরে যান দেশীয় কথকতার শৈলীর কাছে। তাঁর উপন্যাসে সাধারণ খেটে-খাওয়া প্রান্তিকায়িত মানুষেরা যেমন আসে তেমনি আসে আউল-বাউল-ফকিরদের বাচনরীতি। 'চর্যাপদে'র সন্ধ্যাভাষা যেমন আপাত সারল্যের অন্তরালে তত্ত্বকথা শোনায়, তেমনি করে তোলতে চান ভগীরথ তাঁর গদ্যকে। আসে তাঁর আখ্যানে নানা মিথ। আবার কেবল ভগীরথের কথাই বা বলব কেন সাধন চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, শাহযাদ ফিরদৌস, অমর মিত্র, নলিনী বেরা সকলেই নিজের মতো করে সাহিত্যে নিয়ে এসেছেন মিথ, লোককথা, প্রবাদ-প্রবচন মোট কথা লোকসাহিত্য এবং লোকমনের নানা সা(র। আদিম মন যে কাহিনিগুলো তৈরি করেছিল সেগুলোর কাছাকাছি পৌঁছে যেতে চাইছেন একালের লেখকরা মৃত্তিকা সংলগ্ন হওয়ার প্রচেষ্টায়।

যে কোনো উপন্যাসে সাহিত্যিক ঘটনা বা চরিত্রের উপস্থাপনা যে কোনোভাবে করতে পারেন, কিন্তু আমাদের অন্বিষ্ট হয় সেই চিহ্(বা সঙ্কেত যা সময়ের দ্বন্দ্বকে চিহ্নি(ত করে। সেই সময় হতে পারে রাজনৈতিক অথবা হতে পারে সামাজিক। এ সময়ের সময়োপযোগী লেখকরাও এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত। তাই মিথ, লোকপুরাণের আশ্চর্য করেন বিনির্মাণ লেখকরা যা আমাদের মুগ্ধ করে এবং চিন্তার এক নতুন রাজ্যে পৌঁছে দিতে সাহায্য করে। সাধন চট্টোপাধ্যায় 'জলতিমির'-এ অভিজিৎ সেন 'বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর'-এ, শাহযাদ ফিরদৌস 'ব্যাস'-এর মতো আখ্যানে হিন্দু মিথের নবনির্মাণ করেন আবার আফসার আহমেদ 'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা' কিংবা 'কালো বোরখার বিবি ও কুসুমের গন্ধ এবং চল্লিশ জন লোক' প্রভৃতি উপন্যাসে ইসলামিক মিথকে বিনির্মিত করেন। আবার নিজের সময়ের যথাযথ উপস্থাপনার জন্যে কখনো কখনো লেখক তাঁর নিজের সময় থেকে পিছিয়ে গিয়ে উপন্যাসের সময় নির্বাচিত করেন। 'মৃগয়া'র মতো মহাকাব্যিক উপন্যাসে ভগীরথ মিশ্র তাঁর সময় থেকে অনেক পিছিয়ে গিয়ে কাহিনি শু(করেন। শাহযাদ ফেরদৌস মহাভারতের সময়ে পৌঁছে যান 'ব্যাস'-এর প্রে(াপটের খোঁজে। অমর মিত্র কালিদাসের কালো উজ্জয়িনীতে নিয়ে যান পাঠকদের।

এ সময়ের উল্লেখযোগ্য লেখকদের মধ্যে সকলেই সাম্যবাদে বি(্বাসী। আসলে সেটাই তো খুব স্বাভাবিক। যে কোনো সচেতন ব্যক্তি(কেমন করে গরীবের আরো গরীব হয়ে যাওয়া এবং ধনীর জন্যে সব সুযোগ-সুবিধা কু(ীগত হয়ে যাওয়া মেনে নেবে? ধনের অসম বন্টন দেশের বিভিন্ন সমস্যার একটি

প্রধান কারণ জেনে এবং বোঝে পুঁজিবাদকে সমর্থন কোনো যথার্থ বুদ্ধিজীবী করেন না। ফলে একটি নির্দিষ্ট মতবাদে বি(াসী আজকের এই কথাকাররা Arts for Arts' shake মতবাদে বি(াসী নন। তাঁরা সাহিত্য সৃষ্টিকে একটি সামাজিক কর্তব্য বলে মনে করেন। তাঁরা এই কর্তব্যের অনুরোধে সেইসব প্রান্তিকায়িত গোষ্ঠীর কথা সাহিত্যে নিয়ে আসেন যারা দীর্ঘদিন ধরে প্রত্যাখ্যাত অপর হিসেবে ভদ্রসমাজের বাইরে বিচরণ করছে। আর এই গোষ্ঠীগুলির জীবন তাঁরা কেবল অনালোচিত নতুন একটি গোষ্ঠীর কথা বলার জন্যেই বলেন না — তাঁরা আসলে দেখাতে চান মধ্যবিত্তের ড্রইং(মের জীবন অথবা শহরের ঝাঁ চকচকে জীবনই পুরো দেশের কথা নয়। সময়কে যথাযথ চিনতে হলে কেবল আলোকিত দিক নয়, অনালোকিত দিক সম্বন্ধেও জানতে হবে। তাই এঁদের লেখায় টাঁড়টিকর অরণ্যে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সঙ্গে হিজড়াদের নিয়েও তৈরি হয় আখ্যান। নলিনী বেরার 'অপৌ(ষের' না-নারী না-পু(ষ জীবনের ক(ণ কাহিনি শুনায়। আবার নবা(ণ ভট্টাচার্য 'হারবার্ট'-এর মতো উপন্যাসে শহরের বস্তির, রকের জীবন্ত চিত্র তুলে ধরেন।

বিশ ও একুশ শতকের সন্ধিবেলার এই প্রতিষ্ঠান বিরোধী, আধিপত্যবাদের প্রতিস্পর্ধী লেখকগোষ্ঠী নিজেদের লেখনীকে শাণিত রাখার জন্যে বি(সাহিত্য সম্বন্ধে নিজেদের ওয়াকিবহাল রাখেন। ফলে তাঁদের দৃষ্টি এড়ায় না সাহিত্যতত্ত্বগুলিও। ল্যাতিন আমেরিকার জাদু বাস্তবতাবাদ হোক কিংবা নারীচেতনাবাদ অথবা নিম্নবর্গীয় চেতনা বা উত্তর উপনিবেশবাদ প্রতিটি সাহিত্যতত্ত্বের প্রায়োগিক এবং তাত্ত্বিকদিক সম্বন্ধে আজকের বাঙালি কথাকাররা সচেতন। সেইসঙ্গে অনুবাদের মাধ্যমে নানা দেশের নানা ভাষার সাহিত্য আজ আমাদের আওতাধীন। বি(সাহিত্যের এক ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে বাংলা সাহিত্যে একথাও অনস্বীকার্য। বিদেশী সাহিত্যের সম্বন্ধে জ্ঞাত থেকে দেশীয় ঘরানায় আজকের আখ্যানকাররা যখন লিখছেন তা হয়ে উঠছে অনেকান্তিক অনেকার্থদ্যোতক এবং বহুস্বরিক।

একুশ শতকের প্রথম বারো বছর পেরিয়ে এসে আজও অনিশ্চয়তার ঘোর পুরোপুরি কাটেনি। খানিকটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও উল্লেখ করা যেতে পারে নতুন সহস্রাব্দে প্রবেশের সময় প্রযুক্তি(র দুনিয়ায় আসা Y2Kর সমস্যা অথবা নস্ত্রাদামুসের তৃতীয় বি(যুদ্ধের ভবিষ্যৎবাণী অথবা ২০১২ তে পৃথিবী ধ্বংসের ভবিষ্যৎবাণী সবকিছুতেই প্রকাশিত হচ্ছে এক অনিশ্চয়তা। আসলে বিজ্ঞান যত চেষ্টা করছে ভবিষ্যৎকে জানার ততো যেন ভবিষ্যৎ আরো কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে। শতাব্দীর এক দশক পেরিয়ে জনজীবন তথা সাহিত্যে এই অনিশ্চয়তার প্রভাব পুরোপুরি কাটছে না। ফলে একদিকে অস্তমিত শতাব্দীর অন্তিমের লালিমা ও আরেকটি শতাব্দীর ঊষালগ্নের কুয়াশাচ্ছন্নতা সাহিত্যে যে প্রভাব বিস্তার করেচে তা যথার্থই আকর্ষণের বিষয়। সাহিত্যে সবসময়ই দুটো ধারা থাকে একটি প্রথাগত মনোরঞ্জক

সাহিত্য আরেকটি মননশীল প্রথাবিরোধী। একথা বলা বাহুল্য আমাদের এখানে আলোচ্য দ্বিতীয় শ্রেণী।

সত্তর পরবর্তী গত শতাব্দীর শেষ দুই দশকের লেখক যাঁরা এই শতকের প্রথম দশক পার করেও লিখে চলেছেন। তাঁদের লেখায় মুছে যায় সব রৈখিকতা, তাঁরা কল্পনা ও প্রকল্পনাকে মিশ্রিত করেন বাস্তবের বিনির্মাণে। তাঁদের লেখায় কাহিনি সরলরৈখিক আদি, মধ্য আর অন্তবিন্দুও থাকে না। সময় নিয়তির মতো তাঁদের দিয়ে লিখিয়ে নেয় নানা বিষয় নিয়ে নির্দিষ্ট আদি, মধ্য ও অন্তহীন আখ্যান। তাঁরা যা লিখেন খুব সযত্নে চেষ্টা করেন পরবর্তী লেখায় তাকে মুছে ফেলতে। কারণ আত্মবিনির্মাণকে তাঁরা জেনেছেন বেঁচে থাকার যথার্থ পন্থা হিসেবে। স্বনির্মিত পথ ভেঙে দিয়ে নতুন পথ খুঁজে নেওয়া যেহেতু আজকের লেখকদের বৈশিষ্ট্য, তাই একই লেখকের লেখনীজাত ভিন্ন ভিন্ন ধরনের উপন্যাস এই আখ্যানকাররা রচনা করেন। একই লেখক লেখেন 'জলতিমির' এবং 'সাতপু(ষ ডট্ কম্', 'অ(চরিত আর ধ্রুবপুত্র'। এখানে বিশেষভাবে ল(ণীয় যে, এই সময়ের যুগল(ণ সব সাহিত্যিকের লেখনীতে একভাবে প্রকাশ পেয়েছে বা একমাত্রায় প্রকাশ পেয়েছে তা নয়, কিন্তু নানাভাবে তাঁরা চেষ্টা করে গেছেন সময়ের স্বর ও অন্তঃস্বরকে আখ্যানে ফুটিয়ে তোলার।

আমাদের গবেষণা অভিসন্দর্ভে এই লেখকগোষ্ঠীর মাত্র চারজনকে বেছে নেওয়া হয়েছে। প্র(হতে পারে যে এই নির্দিষ্ট চারজনকেই কেন? সাধন চট্টোপাধ্যায়, অভিজিৎ সেন, ভগীরথ মিশ্র এবং অমর মিত্র প্রায় সমবয়সী চার লেখক, যাঁদের লেখায় সত্তর পরবর্তী প্রতিষ্ঠান বিরোধী লেখকগোষ্ঠীর সব বৈশিষ্ট্যই বর্তমান — কিন্তু একই সময়ে বসে, একই ভাবাদর্শে দী(ত হয়েও সময় স্বভাবকে অনুধাবন ও উপস্থাপনার পার্থক্যে উপন্যাস কেমন করে সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়ে পড়ে তার একটা চিত্র আমরা পেয়ে যাই এই চারজনের আখ্যানে। তবু সাযুজ্যও তো রয়ে যায়, এঁরা কেউ কাহিনি বলেন না, কথা লেখেন। এঁরা কেউ পূর্ব নির্ধারিত কাহিনির আদি-মধ্যে ও অন্ত খোঁজেন না, এঁরা লেখার 'হয়ে ওঠা'য় বি(াসী, তাই গু(ত্ব আরোপ করেন বয়ানের মুক্ত(সঞ্চরণে। তাঁরা যেহেতু কেবল কাহিনি লেখেন না, কথাও লেখেন — তাই লেখক ও কথকের দ্বৈতসত্তার উপস্থিতি তাঁদের লেখাকে বিশিষ্ট করে। আধুনিকতা বা আধুনিকোত্তরবাদের বদলে তাঁদের উপন্যাসে আসে প্রাকৃতায়ন ও উত্তরায়ণ-মনস্কতা থেকে ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাণ। ফলে তাঁদের উপন্যাসগুলি পাঠে বাখতিনীয় দ্বিবাচনিকতা এবং উপনিবেশোত্তর চেতনা ও আখ্যানতত্ত্ব আমাদের বিশষ সাহায্য করে। পলে এই চারজনের লেখায় আমরা পেয়ে যাই সময় অনুশীলনের (ে ত্রে ভিন্ন হয়েও অভিন্ন চিন্তাধারা। আবার এই চারজনের মাত্র দুটো করে উপন্যাস চয়ন করার কারণ হল গবেষণা সমসময়ই একটি নির্দিষ্ট ল(্যাভিমুখী হতে হয়। গবেষণাকে প্রয়োজনীয় সূচীমুখ করার জন্যেই চার কথাকারের প্রতিনিধি স্থানীয় উপন্যাসকে গ্রহণ করতে হয়েছে। বহুমাত্রিক সময়ের জটিলতাকে

ইতি ও নেতির দ্বিরালাপে বুঝে নেওয়ার প্রচেষ্টাকে যেভাবে আখ্যানে রূপ দিচ্ছেন এই আখ্যানকাররা তার বিস্তারিত আলোচনা করার সুবিধা একটি গবেষণা অভিসন্দর্ভে সম্ভব নয়। সীমিত পরিসরের অনুরোধে চারজন উপন্যাসিকের দুটি করে মাত্র আটটি উপন্যাস নিয়েই এ আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখা হল। বিগত শতাব্দীর 'রহু চন্ডালের হাড়' (১৯৮৫), 'বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর' (১৯৯৫), 'চারণভূমি' (১৯৯৪), 'জানগু(' (১৯৯৫), 'জলতিমির' (১৯৯৮), 'অ(চরিত' (১৯৯৯) এবং এই শতাব্দীর 'ধ্রুবপুত্র' (২০০২) ও 'সাতপু(ষ ডট্ কম্' (২০০৫) এই আটটি উপন্যাসের আলোচনায় আমাদের এই গবেষণা অভিসন্দর্ভ গড়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে বলে নেওয়া ভালো যে, আটটি উপন্যাসের মধ্যে গত শতাব্দীর ছয়টি এবং বর্তমান শতাব্দীর মাত্র দুটি উপন্যাস চয়ন করা হয়েছে। বিগত শতকের প্রতি এই প(পাতিত্বের কারণ হল বর্তমান এই শতকের যুগল(ণ এখনো আমাদের কাছে খুব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেনি। আবার ঠিক একই কারণে সাহিত্যেও তা এখনো পুরোপুরি খুব সুস্পষ্ট নয়। নয়া সাম্রাজ্যবাদের যে আগ্রাসন আমরা গত শতাব্দীর শেষের দিক থেকে দেখছিলাম তা এ শতাব্দীতেও সত্রি(য়। গত শতকের শেষ দুই দশকের সাহিত্যের চরিত্র বৈশিষ্ট্যের প্রলম্বিত ছায়া এ শতকেও বিস্তার করেছে আর এক দশক পার করেই যেহেতু যুগল(ণকে চিহ্নি(ত করা প্রায় অসম্ভব তাই এই বৈষম্য করতে হল, খানিকটা বাধ্য হয়েই। এই আখ্যানকারেরা সমাধানের নিশ্চয়তাহীন জীবনে নিরন্তর খুঁজে চলেছেন পথ-পাথেয় ও গন্তব্য। তাদের সেই অনুসন্ধানের খানিকটা পরিচয় আমরা দেওয়ার চেষ্টা করেছি পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে।

তথ্যসূত্র ঃ

১. রণজিৎ দাশ, রণজিৎ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, এপ্রিল ২০০৯, পৃ. ৮৫।

২. তাপস ভৌমিক সম্পাদিত কোরক ঃ প্রাক্ শারদ সংখ্যা, ১৪১৫, পৃ. ২৬।